গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১২ - ১৮ জুলাই, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

উত্তরাখণ্ডে চিকিৎসারত মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের হাতে সংগৃহীত অর্থ ও ওষুধ তুলে দেওয়া হল

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরার হাতে ওষুধ তুলে দিচ্ছেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। (ডান দিকে) রুদ্রপ্রয়াগে বেস ক্যাম্প

৬ জুলাই কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্ব হারানো মানুষের সাহায্যার্থে রাজ্য জুড়ে সংগৃহীত অর্থ ও ওষুধ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের হাতে তুলে দেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

একটা মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিধ্বংসী ঘটনা ঘটে গিয়েছে উত্তরাখণ্ডে। যেখানে এখনও পর্যন্ত সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী ১০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। আমাদের কাছে খবর আছে প্রকৃত সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। এই এলাকায় পাহাড়ি নদীর ধারে ধারে যে গরিব মানুষরা বাস করেন, তাদের গ্রামের পর গ্রাম লোপাট হয়ে গিয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ পাথর চাপা পড়ে, নদীর প্রবল জলস্রোতে আহত হয়ে, পঙ্গু হয়ে এখনও বেঁচে আছেন। এ অবস্থায় একটি মেডিকেল সংগঠন অত্যন্তপ্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'-এর নাম আপনারা জানেন। এ দেশের সুনামি থেকে শুরু করে বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের ত্রাণে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রুদ্রপ্রয়াগে ওঁরা একটি বেস ক্যাম্প করেছেন। সেখানে পশ্চিমবাংলা থেকে ৬ জন, চণ্ডীগড় থেকে ৩ জন, দিল্লি থেকে ৪ জন, গোয়ালিয়র থেকে ৩ জন, মহারাষ্ট্র থেকে ১

দুইয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোটে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড সৌমেন বসু

৬ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, নির্বাচনী লড়াইয়ে কোথাওই এখন গণতন্ত্র, আদর্শবাদ, জনদরদ প্রভৃতি সদর্থক কোনও কিছুই নেই। তার অত্যন্ত কুৎসিত রূপটি দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। যে কোনও নির্বাচনেই এখন জয়-পরাজয় নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে মিডিয়ার প্রচার, মাসল পাওয়ার, প্রশাসনিক ক্ষমতার পক্ষপাতিত্বের উপর। এবং এই সবগুলো অর্জন করার জন্য ধনকুবের পুঁজিপতি শ্রেণির অর্থানুকূল্য আজ সবচেয়ে জরুরি। তাদের প্রত্যক্ষ অঙ্গুলি হেলনে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি পরিচালিত হয়। এই পথেই দেশের প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তারা। এর ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। ফলে নির্বাচনে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হয় না বললেই চলে। অনেক সময় দেখা যায়, জনসাধারণ যে দলকে ঘৃণা করছে, তারাই হঠাৎ

সাতের পাতায় দেখুন

প্রশ্ন করলেই পুলিশি হেনস্থা!

জঙ্গলমহল, কামদুনির পর সুটিয়া। প্রতিবাদ করলে, প্রশ্ন করলেই পুলিশ, সিআইডি লেলিয়ে দেওয়ার নবতম সংযোজন ঘটল সুটিয়ার প্রতিবাদী মানুষদের উপর। সিপিএম আমলে উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া এলাকায় সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে সাহসী যুবক বরুণ বিশ্বাস এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। সরকারের পরিবর্তন হলে সমাজবিরোধীরাও শিবির বদলায়। আশ্রয় নেয় শাসক শিবিরে। খুন হন বরুণ বিশ্বাস। কিন্তু মানুষের প্রতিবাদ চলতে থাকে। বরুণের প্রতিষ্ঠিত প্রতিবাদী মঞ্চ আজও সমান জাগ্রত। সম্প্রতি বরুণবাবুর বাবা জগদীশ বিশ্বাস, মঞ্চের সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দারসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্র এবং সমাজবিরোধী যোগাযোগের অভিযোগ জানিয়ে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ করেছেন এলাকার দুই তৃণমূল নেতা।

জঙ্গলমহলের শিলাদিত্য চৌধুরীকে অনেকেরই মনে আছে। গত বছর বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে 'মাওবাদী' বলেছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরেছিল। টিভির টক শো-তে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যে নারীর নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশ্ন করায় বিপদে পড়েছিলেন কলেজ ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ। পুলিশ তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে দিয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে এক রাত পুলিশ হেফাজতে কাটাতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কার্টুন আঁকার অপরাধে। সম্প্রতি কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের বেশ কিছু দিন পর মুখ্যমন্ত্রী এলাকায় গেলে স্থানীয় মানুষ দুষ্কৃতীদের দ্রুত বিচার এবং শাস্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে 'চোপ' বলে ধমকে ওঠেন। মুখ্যমন্ত্রী এই বিক্ষোভকে পরিকল্পনামাফিক বলে অভিহিত করেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের তৎপরতা। বিক্ষোভকারীদের সম্পর্কে পুলিশি রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে।

একের পর এক ঘটনায় রাজ্যের মানুষ বিস্মিত, স্তম্ভিত। তবে কি রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না? প্রশ্ন করলেই তাঁদের বিরুদ্ধে এ ভাবে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে হেনস্থা করা হবে? এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর দলের নিচের তলার ছোটখাটো নেতারাও আজ একই রাস্তা নিচ্ছেন। এটা তো একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ভাবেই মন্ত্রী- এম এল এ-রা নির্বাচিত। তাঁরা তো নিজেদের জনগণের প্রতিনিধি বলেন, তাহলে তাঁদের প্রশ্ন করার অধিকার তো সাধারণ মানুষের রয়েছে। তা হলে কি তাঁরা জনগণকে ভয় পাচ্ছেন? এ জিনিস তো সিপিএম

পাঁচের পাতায় দেখুন

হায় রে বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা!

"ইউ এস এ, হোয়্যার লিবার্টি ইজ এ স্ট্যাচু"

সি আই এ-র কর্মচারী এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা গোয়েন্দা তথ্যের ধাক্কায় ভেঙে পড়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার বড়াই। এই তথ্য ফাঁসের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার ভেকধারী মার্কিন শাসন ব্যবস্থার ভিতরকার দুর্গন্ধ বেরিয়ে পড়তেই শাসকরা হুলিয়া জারি করেছে স্নোডেনের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেন সে নাগরিকদের উপর শাসকদের গোপন গোয়েন্দাগিরির তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করে দিল। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে দেশ ছাড়তে হয়েছে স্নোডেনকে। কোথায় গেলেন স্নোডেন, দুনিয়ার দেশে

প্রসঙ্গ স্নোডেন

দেশে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বেশ কিছু দেশের কাছেই স্নোডেন আশ্রয় ভিক্ষা চেয়েছেন, যার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত। শান্তি, অহিংসা ও গণতন্ত্রের নাকি তীর্থস্থান ভারত। এমনটাই বলে থাকেন বিশ্বের 'গণতন্ত্র পূজারিরা'। সেই ভারতের সরকারও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, স্নোডেনকে আশ্রয় দেওয়া হবে না। কারণটা বুঝতে সমস্যা নেই। স্নোডেনকে আশ্রয় দিলে মার্কিন শাসকরা চটবে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের বিমানে স্নোডেন আছেন, এই অভিযোগে যেভাবে নানা দেশ ঐ বিমানকে জ্বালানি ভরতে না দিয়ে ধ্বংসের বিপদ নিয়ে আকাশপথে

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ ।। বিকাল ৪টা

SUCI (C)

হায় রে বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা!

একের পাতার পর

থাকতে বাধ্য করা হল, তা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে 'গণতান্ত্রিক' দুনিয়া কীভাবে একজন প্রতিবাদী মানুষকে স্থান দিতেও অপারগ হয়ে পড়েছে। শেষপর্যন্ত মান রেখেছে ভেনেজুয়েলা ও নিকারাগুয়া। মার্কিন রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা স্নোডেনকে আশ্রয় দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

কী তথ্য ফাঁস করেছেন স্নোডেন? তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন মার্কিন নাগরিকদের উপর শাসকদের গোয়েন্দাগিরির খবর। স্নোডেন বলেছেন, মার্কিন প্রশাসন জাতীয় নিরাপত্তার নামে লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিকের ই-মেলের চিঠি পত্র ও টেলিফোন কথোপকথনের ওপর নজরদারি চালিয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মী হিসাবে তাঁকে অপরের ই-মেল চুরি করার (হ্যাক করার) অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইলেকট্রনিক নজরদারিতে মার্কিন সরকার অসম্ভব রকম দক্ষ। সংবাদে প্রকাশ, এর আগে জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির অপর এক কর্মী টমাস ড্রেক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, "মার্কিন সরকার সংবিধানের আদৌ তোয়াক্কা করে না।" মার্কিন গুপ্তচরদের হীন অপকর্মের কথা লিখেছিলেন ফিলিপ অ্যাগি গত শতকের সাতের দশকে প্রকাশিত তাঁর বহুখ্যাত 'সি আই এ ডায়েরি'-তে। এ সব লেখার জন্য ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে মার্কিন প্রশাসন সহজেই ফিলিপ অ্যাগির গায়ে রুশ গোয়েন্দা দপ্তর কেজিবির ও কিউবার দালাল হিসাবে ছাপ মেরে দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তথ্য ফাঁসের জন্য তিনি নাকি দশ লক্ষ ডলার নিয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রকাশিত তথ্যগুলি যে ভ্রান্ত এমন কোনও কথা শোনা যায়নি।

১৯৭০ সালে মার্কিন সেনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ বলেছিলেন, জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সিকে যেভাবে ব্যাপক গুপ্তচরবৃত্তির অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তাতে তা যদি বিদেশি শত্রুর বদলে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তবে দেশের গণতন্ত্রের দফারফা হয়ে যাবে। যে মার্কিন মানবাধিকার ও ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারের কথায় বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা উল্লসিত বোধ করেন, বাস্তবে এই হল তার চেহারা। বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা একদা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কনফেডারেশন সরকারের ১১ বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস আত্মস্থ করে সেরা মার্কিন গণতন্ত্রীরা সংবিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার দেওয়ার যে কথা বলেছিলেন, তার যতটুকু রূপায়ণ হয়েছে তা দেখে অনেকেই একদা মার্কিন গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আজ সেই রাষ্ট্র তার নাগরিকদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছে, গণতন্ত্রের বিকাশের পরিবর্তে তা একটি পুলিশি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইদানীং নানা সময় ই-মেলে সতর্কবার্তা এসেছে — 'সাবধান, আপনার ই-মেল বা ফেসবুকে কথোপকথন গোপন থাকছে না, তার উপর সি আই এ-র নজরদারি আছে'। স্নোডেনের ঘটনায় গুগল ও ইয়াহু কোম্পানি স্বীকার করেছে, সি আই এ-র তালিকা অনুযায়ী তারা কয়েক হাজার ব্যক্তির ই-মেল, ফেসবুকের লেখা সি আই এ-কে দিয়েছে।

এই সব ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, মার্কিন পুঁজিবাদ জনগণকে কত আতঙ্কের চোখে দেখে, তার সবচেয়ে বড় ভয় দেশের মানুষ যদি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। মার্কিন সরকার যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নিয়ে চলছে তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ওবামা রাষ্ট্রপতি পদে বসার আগে ইরাকযুদ্ধ নিয়ে যে প্রতিশ্রুতিই দিন আজও সেই যুদ্ধের খরচ জুগিয়ে চলেছে মার্কিন জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় তৈরি সরকারি তহবিল। এর ফলে জনস্বার্থে বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান। ইতিমধ্যেই যুদ্ধ বাবদ খরচ হয়েছে দেড় লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি। সাড়ে চার হাজার মার্কিন সেনা ও ইরাকি শিশু বৃদ্ধ সহ সব মিলিয়ে প্রায় লাখ দেড়েক মানুষ মারা গিয়েছেন এই যুদ্ধে। মার্কিন প্রশাসনের বসানো পুতুল সরকারের বর্তমান শাসনে আজও ইরাকে প্রায় প্রতিদিন হত্যাকাণ্ড ঘটছে। মানুষ মারার জন্য যুদ্ধে টাকা ঢালা হচ্ছে, অথচ মার্কিন জনগণের বেকারি ঘোচাতে সরকারি তহবিলের টাকা জোটে না। বিরোধীদের আশঙ্কা, এইভাবে গণ নজরদারি চালানোর একটা লক্ষ্য হল জনগণের মধ্যে কারা যুদ্ধ বিরোধী ও সরকার বিরোধী তাদের খুঁজে বের করা। এই না হলে গণতন্ত্র! এরা যুদ্ধও করে আবার শান্তির ভেকও ধারণ করে। সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের আন্দোলন মার্কিন প্রশাসনের শান্তিকামিতার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন সহ বিশ্বের দেশে দেশে যেভাবে পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে তাতে তারা আতঙ্কিত। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন' শাসকদের প্রবলভাবে শঙ্কিত করেছে। ৮০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক এই আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। এজন্যই যে কোনও পথে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন দমন করতে মার্কিন দমননীতি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল।

এডওয়ার্ড স্নোডেনকে যে আইনে মার্কিন সরকার শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, সেটি ১৯১৭ সালে রচিত আমেরিকার 'এসপায়োনেজ অ্যাক্ট'। এই আইন ভঙ্গের অভিযোগেই ১৯৫৩ সালের ১৯ জুন নিউইয়র্কের সিঙসিঙ কারাগারে এথেল রোজেনবার্গ ও জুলিয়াস রোজেনবার্গকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের সময় এই দুই আদর্শবাদী কমিউনিস্টের বিচার করা হয় এই অভিযোগে যে, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে অ্যাটম বোমা তৈরির গোপন তথ্য পাচার করেছেন। মিথ্যা সাক্ষী ও তাঁদের আইনজীবীদের কিছু জানতে না দিয়ে গোপন প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারপতি ও প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে চিঠি লিখে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও এর বিরোধিতা করেছিলেন।

আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে ঐ বিচার ও রায়ের প্রতিবাদে জনগণ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, কিন্তু মার্কিন শাসকরা জনমতের কোনও মূল্য না দিয়ে, ঐ দম্পতিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা একটি বার্তাই দিয়েছে ঃ "আমাদের বর্ণবিদ্বেষী শাসন, আমাদের শোষণ-অত্যাচার, আমাদের যুদ্ধ, আমাদের গণতন্ত্র প্রভৃতির যদি বিরুদ্ধতা করো, তবে তোমাদের জন্য কঠিন বর্বর শাস্তি অপেক্ষা করছে।" ঠাণ্ডা যুদ্ধের কমিউনিস্ট বিদ্বেষী প্রচারেরই অংশ এটি। যার জোরে হাজার হাজার মানুষের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, জনমনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাড়হিম করা ত্রাস।

বর্তমানেও সেই একই আইনে গোপন বিচারে শাস্তি দেওয়ার আয়োজন করা হচ্ছে বি ম্যানিংকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনিই নাকি মার্কিন সরকার ও সামরিক বিভাগের নানা অত্যাচারী কাজকর্ম ও দুর্নীতির কথা উইকিলিকসকে ফাঁস করেছেন। এ বার টার্গেট করা হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির পূর্বতন প্রযুক্তিবিদ এডওয়ার্ড স্নোডেনকে। হিটলার যেমন কোনও বিরোধিতাকে সহ্য করতেন না আজ সেই ফ্যাসিস্ট প্রবণতা মার্কিন গণতন্ত্রে পরিপুষ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার অভ্যন্তরে জার্মানির অন্তর্ঘাত আটকাবার কথা বলেই ১৯১৭ সালে মার্কিন কংগ্রেস এই আইনটি প্রণয়ন করে। ১৯১৮ সালে প্রণীত অ্যালিয়েনও সিডিশন আইন সহ আরও যেসব দানবীয় আইন ছিল তার সাথে যুক্ত করে এই এসপায়োনেজ অ্যাক্টের দ্রুত টার্গেট হয়ে দাঁড়ায় বিশেষত সোভিয়েট বিপ্লবের পর প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও শ্রমিক নেতারা। সমাজতান্ত্রিক নেতা ইউজিন ডেবস-এর ১০ বছর কারাদণ্ড হয় শুধু এ কারণে যে তিনি এই আইনটিকে অসাংবিধানিক বলেছেন। এইসব দানবীয় আইনের জোরেই ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের জেলবন্দি করা হয়, অনেককে কোনও অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই আমেরিকা থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

শত বছরের পুরনো ১৯১৭ সালের এই আইনকেই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে বি ম্যানিঙের বিরুদ্ধে বিচারে। কারণ, তিনি মার্কিন সরকারের জঘন্য অপরাধের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাড়তি রসদ জোগাতে ১৯৬৪ সালে টনকিন উপসাগরের ঘটনাকে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন কীভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে দেশের মানুষকে প্রতারণা করেছিলেন, সেই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল এলসবার্গ। এ জন্য তাঁকেও ১৯১৭-র আইনেই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। আজকের যুগে যখন বিশ্বের দেশে দেশে তরুণ শ্রমিক কর্মচারী ও লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক তাদের বিক্ষোভ সংগঠিত করতে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ও তাদের মদতপুষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে সেলফোন ও সোস্যাল নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করছে, তখন স্নোডেনের মতো খোদ সি আই এ-র লোক যদি ফাঁস করে দেন যে, মার্কিন প্রশাসন নাগরিকদের ফোন ও ই-মেলের উপর নজরদারি চালাচ্ছে, তবে মার্কিন সরকারের তোপের মুখে তাকে পড়তে হবেই।

মার্কিন শাসকরা দাবি করেছেন যে, স্নোডেন যা ফাঁস করেছেন, তার ফলে নাকি মার্কিন শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা 'সন্ত্রাসবাদীদের' দ্বারা বিপন্ন হবে। স্নোডেনের এই কাজকে কী চোখে দেখছেন আমেরিকার জনগণ? নিউপোল সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৩৩ শতাংশ আমেরিকান বলছেন স্নোডেন ঠিক কাজ করেছেন, ৩৮ শতাংশ বলছেন ঠিক কাজ করেননি, ২৯ শতাংশ বলছেন তারা নিশ্চিত বলতে পারছেন না। কিন্তু হাফপোস্ট/ইউগোভ সংস্থার সমীক্ষা দেখাচ্ছে ৩৮ শতাংশ বলছেন স্নোডেন ঠিক কাজ করেছেন, মাত্র ৩৫ শতাংশ বলেছেন তিনি ঠিক করেননি। ফলে জনস্বার্থ বিপন্ন হবে এ অভিযোগ সত্য নয়। আসলে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে এই যুক্তি দুর্জনের ছলনা ছাড়া কিছু নয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র দাবি করে যে, নাগরিক স্বাধীনতা, ব্যক্তির নিজস্ব মত রক্ষার অধিকার, ব্যক্তির প্রাইভেসি অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনের মর্যাদা একমাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই রক্ষিত হয়। এক সময় বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা এ কথা ভেবেছিলেন ও শুরুর যুগে এ সবের প্রতি মান্যতাই দেখাত বুর্জোয়া গণতন্ত্র। কিন্তু সেদিন আজ অতীত! আজ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্যে কীভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর বুর্জোয়া রাষ্ট্রই গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে তা ধ্বংস করছে, স্নোডেনের ঘটনা সেটাই পুনরায় প্রমাণ করল। আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পচনের চিহ্ন আজ সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোচ্ছে সকল দেশেই। এই ব্যবস্থাকে কবরে পাঠিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবেই প্রতিভাত হচ্ছে।

'মার্কিন অপকর্ম ফাঁস করে স্নোডেন কোনও অপরাধ করেননি'

স্নোডেন রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে বলিভিয়া তাঁকে আশ্রয় দেবে প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের এই ঘোষণা তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের পরিপূরক, ৫ জুলাই এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। তিনি বলেন, এই ঘোষণার জন্য মোরালেস আমেরিকার রোষের কবলে পড়েন। আমেরিকার চাপেই ফ্রান্স-পর্তুগাল-ইতালি-স্পেন মোরালেসের উড়ানের জন্য 'এয়ার স্পেস' দিতে অস্বীকার করে। তাঁর উড়ানকে জোর করে ভিয়েনাতে নামানো হয়, সেখানে স্নোডেন আছেন কি না তল্লাসির জন্য। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই অবৈধ কাজকে তীব্র নিন্দা করে কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, স্নোডেন কোনও অপরাধী নন। তিনি মার্কিন সরকারের অপরাধমূলক কাজ ফাঁস করে দিয়ে একটি মহৎ কাজই করেছেন।

অর্থ ও ওষুধ তুলে দিল এস ইউ সি আই (সি)

একের পাতার পর

জন, গুজরাট থেকে ৪ জন, তামিলনাড়ু থেকে ১ জন, উত্তরপ্রদেশ থেকে ৩ জন এই মোট ২৫ জন মেডিকেল স্টাফ সেখানে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন ডাক্তার, ৩ জন নার্স, ১২ জন প্যারামেডিকেল কর্মী রয়েছেন। ২৮ জুন থেকে প্রতিদিন তাঁরা অসুস্থদের চিকিৎসা করছেন। কোনও দিন ৩০০, কোনও দিন ৪০০ মানুষের চিকিৎসা তাঁরা করছেন। ২০টি ক্যাম্পে ৯০টি গ্রাম ও শহরের তিন হাজার রোগী এখনও পর্যন্ত তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা অ্যাডভান্স মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন বাঁশওয়াড়াতে। ভিরিতে একটি ইনভেস্টিগেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সিলি, সুমারি, চোপড়া, কর্ণপ্রয়াগে মোবাইল মেডিকেল টিম পাঠিয়ে চিকিৎসার কাজ পরিচালনা করছেন।

আমরা এই নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও এবং এ রাজ্যে প্রবল বর্ষার প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটা দিন ত্রাণ সংগ্রহ করেছি। সংগৃহীত অর্থের একটি চেক 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'-এর সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। রাজ্য জুড়ে আমরা বিভিন্ন দোকান থেকে ওষুধ সংগ্রহ করেছি। কলকাতার দোকানগুলি থেকে সংগৃহীত ওষুধ এখানে আছে। অন্যান্য জেলা থেকে সংগৃহীত ওষুধ আমরা এখানে আনতে পারিনি। কলকাতায় সংগৃহীত ওষুধের আর্থিক মূল্য দু'লক্ষ টাকা। অন্যান্য জেলা থেকে সংগৃহীত ওষুধের আর্থিক মূল্য ৮-১০ লাখ টাকা। ওঁরা রুদ্রপ্রয়াগের ক্যাম্পটি মাসব্যাপী পরিচালনা করবেন। আমি তাঁদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরাকে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁর হাতে আমি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকার চেকটি তুলে দেব। আমরা আশা করব পশ্চিমবাংলার গর্ব 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার' যারা আজকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁরা এই শিবির সাফল্যের সাথে পরিচালনা করবেন। আমরা আরও অর্থ ও ওষুধ সংগ্রহ করে তাঁদের হাতে তুলে দিতে চাই।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ অশোক সামন্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

‘সিকিউরিটি’ও একটা লাভজনক ব্যবসা

পশ্চিমবাংলার আমলাশোল, লালগড় থেকে শুরু করে আদিবাসী অধ্যুষিত দেশের আটটি রাজ্য দারিদ্রের ভয়াবহ কবলে। ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র, ওড়িশা, বিহার, কর্ণাটক, ছত্তিশগড় সহ সর্বত্র আদিবাসী ও দলিতরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। জীবন-জীবিকা বিপন্ন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে তারা রক্তাক্ত। নারী ধর্ষণ, খুন, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ অবাধ। মিথ্যা মামালায় জেলে পচছে শত শত মানুষ। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে চলছে ‘অপারেশন গ্রিন হান্ট’, ‘সালোয়া জুডুমে’র মতো নানা নামে নানা সশস্ত্র বাহিনী যে টাটা বা এসারের মতো শিল্পপতি গোষ্ঠীর টাকায় আজ সক্রিয় এমন খবরও সংবাদে দেখা যায়।

নিরাপত্তা কোথায় সাধারণ মানুষের?

সারা দেশে নারী পাচার, শিশু পাচার, ধর্ষণ, খুন বাড়ছে। বাড়ছে শিশু শ্রমিক। খাদ্য সুরক্ষার নামে চলছে প্রতারণা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দৈনিক ১৫-২০ টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতা নেই। ছাঁটাই, লকআউট, লে-অফে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনে অনাহার-অনিশ্চয়তার করাল গ্রাস। লক্ষ লক্ষ চাষি ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে নিরাপত্তাহীনতার কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুদের আমলে তাদের হিসেবে ২ কোটি মানুষ এ রাজ্যে অর্ধাহারে অনাহারে থাকত। বেকারি বেড়েছে রেকর্ড সংখ্যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ দিশাহীনভাবে বসত বাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে শুধু নয়, বিদেশের বাজারে ছুটছে কাজের খোঁজে। বছরে এই সংখ্যা আড়াই কোটি। এই হিসেব স্বয়ং কেন্দ্রের এক মন্ত্রী কমল নাথের। রাজ্যে রাজ্যে চাষিদের লক্ষ লক্ষ একর জমি কেড়ে নিয়ে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাত তুলে দেওয়া হচ্ছে। যেমন হয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে।

আত্মরক্ষার চেষ্টায় গড়ে উঠছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। তাকে দমন করতে চলছে লাঠি, গুলি। চলছে গুণ্ডাদের দ্বারা খুন, ধর্ষণ। মালিকগোষ্ঠী, ক্রিমিন্যাল, প্রশাসনের এক দুষ্ট চক্র জনজীবনের সামনে বিরাজমান আতঙ্ক। তারা সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। ছাত্রী ধর্ষণ-খুন, গৃহবধূ ধর্ষণ-খুন, শিশু বৃদ্ধাদেরও নিস্তার নেই। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের স্মৃতি এখনও মানুষ ভোলেনি। এখানেও নেমেছিল সরকারি সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি ক্রিমিন্যাল ও তথাকথিত পার্টির ‘শান্তি বাহিনী’! ভোলেনি কেশপুর, গড়বেতা, সুঁটিয়া। ভোলেনি বারাসাত, বনগাঁ। একই চিত্র রাজ্যে রাজ্যে — ডিগ্রির যা পার্থক্য এইটুকু। একটা গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের ৯৯ শতাংশই আজ নিরাপত্তাহীনতার শিকার। বিদ্যমান পুঁজিবাদী শাসন আজ জনগণকে এমনই এক সন্ত্রাসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। পুঁজিবাদী রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির ভয়াবহতা ও আগ্রাসী থাবায় সকলেই গভীর উৎকণ্ঠায়। আইন-আদালতেও জনতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ার বদলে বিপন্ন হচ্ছে। দিল্লি, গুজরাত সহ রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গাবাজরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষমতাসীন নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত, এমনকী জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতার শিকার। সরকার-প্রশাসন-দুষ্কৃতী চক্র সংখ্যা লঘুদের, গরিব নিম্নবর্ণের মানুষের সামনে ত্রাসের সঞ্চার করছে। নিপীড়িত জনতা সবাই আজ নিরাপত্তাহীন। অথচ সরকার, রাষ্ট্র, আইন সংবিধান অনুসারে জনজীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ ছিল।

সারা বিশ্বেই আজ এমন অবস্থা। আমেরিকার ‘ওয়াল স্ট্রিট’ দখল আন্দোলন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়েছে। স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগালের জনগণ সে দেশের শাসকের বিরুদ্ধে ফুঁসছে। তাই ব্রাজিলে এক ধাক্কায় ২৫০ জন নিহত হল। রাষ্ট্র বলল দুঃখিত, ভুল করে হত্যা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যেও সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ মুখর। মিশরের আগুন নেভেনি। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে তুরস্কও। সর্বত্র নামছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের রক্ষা কবচ নয়। সর্বত্র ধ্বনি উঠছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। কোথাও কোথাও আন্দোলনের জোরে শাসকদের, মালিক গোষ্ঠীকে মাথা নামাতে হচ্ছে, মালিকশ্রেণি-প্রশাসন-ক্রিমিন্যাল বাহিনীর সঙ্গে নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার দাবিতে শোষিতশ্রেণি আজ সম্মুখ সমরে। দুই শ্রেণি আজ ভয়ঙ্কর এক শ্রেণিযুদ্ধে লিপ্ত। শাসক শ্রেণির আক্রমণ যত বাড়ছে যুদ্ধ তত তীব্র হচ্ছে। প্রতিরোধও বাড়ছে।

রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর মালিক শ্রেণি নির্ভর করাই শুধু নয়, পাশাপাশি গড়ে তুলছে সমান্তরাল এক সশস্ত্র শক্তির ফ্যাসিস্ট বাহিনী। গড়ে তুলছে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি (পিএসএ) — মালিকী সংস্থার বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী। মালিকদের সেবাদাস

রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর মালিক শ্রেণি নির্ভর করাই শুধু নয়, পাশাপাশি গড়ে তুলছে সমান্তরাল এক সশস্ত্র শক্তির ফ্যাসিস্ট বাহিনী। গড়ে তুলছে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি (পিএসএ)— মালিকী সংস্থার বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী। মালিকদের সেবাদাস সরকারগুলো দেশে দেশে এই বাহিনী গড়ে তুলছে। গড়ে তুলতে সাহায্য করছে ভারত সরকারও। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মূল্যবোধ ধ্বংস করে সরকার, কমিটেড আইন, শাসক অনুগত আদালত, প্রশাসনের সঙ্গে মালিকদের জোট গড়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ফ্যাসিবাদী জমানা, গণতন্ত্রের নামেই। হিটলার-মুসোলিনীর উত্তরসূরীদের কৌশলী আধুনিক রূপ তো এটাই।

সরকারগুলো দেশে দেশে এই বাহিনী গড়ে তুলছে। গড়ে তুলতে সাহায্য করছে ভারত সরকারও।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মূল্যবোধ ধ্বংস করে সরকার, কমিটেড আইন, শাসক অনুগত আদালত, প্রশাসনের সঙ্গে মালিকদের জোট গড়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ফ্যাসিবাদী জমানা, গণতন্ত্রের নামেই। হিটলার-মুসোলিনীর উত্তরসূরীদের কৌশলী আধুনিক রূপ তো এটাই।

নিরাপত্তা এখন বাজারের পণ্য। তারও কেনাবেচা চলে। ধনীরা তা কেনে। কেনা-বেচাতেও লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মুনাফা হয় মালিকদেরই। সরকার তার ব্যবস্থা করে দেয়। কলকাতা পুলিশ রেকর্ডে ১৭০টা নথিভুক্ত প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি আছে কলকাতাতেই। আছে অনেক অনথিভুক্ত সংস্থাও। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে সিকিউরিটির নলেজ স্কিল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অর্থাৎ বাহিনীর তালিম হয়। পাহারা দেওয়া, চোর-ডাকাতের হামলা আটকানো, দুর্ঘটনায় মানুষ বাঁচানো এ সবের তালিম। শপিংমল, হাউসিং কমপ্লেক্সে এদের চাহিদা। এগুলি অবশ্য খানিকটা আসল প্রয়োজনের বাই প্রোডাক্ট, মুখ্য উদ্দেশ্য লুকানোর মানবিক মুখোশ মাত্র।

সংবাদে প্রকাশ, ২০০৯ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডকে দিয়ে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডসদের প্রশিক্ষণ দেবে (দি হিন্দু ঃ ০৯.০৯.’০৯)। পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি রেগুলেশনস বিল ২০০৯ পাঠানো হয়েছে পার্লামেন্ট ও রাজ্যসভায় আলোচনার পর ২০০৯-এ। জুন ২০০৫ এ তৈরি হয়েছে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিস (রেগুলেশন অ্যাক্ট)। ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির মডেল রুল তৈরি করে। রাজ্যগুলিও এই পথে চলছে। দিল্লি, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, ওড়িশা, তামিলনাড়ু সহ বিভিন্ন রাজ্য এ পথে চলছে। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী সংগঠিতভাবে এই বাহিনীর হাতে ব্যাপক হারে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। ২০০৯ সালে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে এই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে দিতে হবে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্দেশ্য — “সন্ত্রাস মোকাবিলা করা।”এ ছাড়া রয়েছে সেজ এলাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে ভারতীয় গোষ্ঠীগুলি যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। গড়ে উঠেছে সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রি (সিএপিএসআই)। এদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত শিক্ষা ও তালিম। আমেরিকা ও ইজরায়েলের মতো সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী দেশগুলো থেকে আনা হয়েছে উপযুক্ত যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি।

অবসরপ্রাপ্ত ও প্রাক্তন সামরিক অফিসার, সেনা, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের এই বাহিনীতে নিযুক্ত করা হচ্ছে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার মেল বন্ধন হচ্ছে। জাতীয় স্তরে বিশাল প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি (পিএসসি) যেমন জি-৪ এস যার নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা ১লক্ষ ৬০হাজার জন। টপস্‌গ্রুপস্‌, এসআইএস, এপিএস গ্রুপ, গ্লোব, এইএসসি সিকিউরিটি টেকনোলজি কোম্পানি যেমন ২১ কম, এস ডি ডি সিসকো প্রভৃতি আদান-প্রদান-সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে। এ বি হচ্ছে সুইডেনের। প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি বিশ্বের বৃহত্তম উইলসং, সার্ভিসেস-এর ৪৯ শতাংশ অংশীদার হয়েছে ২০০৭ সালেই। ২০০৬ সালে পিনকারটন গ্রুপ ভারতে তার শাখাও খুলেছে। স্পেনের বহুজাতিক প্রসেগার দ্বিতীয় বৃহত্তম। এর সাথে দিল্লির সিকিউরিটি ও ইনটেলিজেন্স সারভিসেস যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে এ দেশে। মার্কিন পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ব্ল্যাক স্টোন ভারতীয় সংস্থার সাথে ১৫০-২০০ কোটি টাকার ব্যবসায়িক চুক্তিও করেছে।

ভারতীয় বাজারের বাড়বাড়ন্তের সম্ভাবনা নিয়ে ১৯৮৮ সালেই নিউ ইয়র্ক টাইমস লেখে ভারতীয় নিরাপত্তা শিল্পে ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত । ২০১১ সালে অ্যাসোচেম ও অ্যাভিওটেকের হিসাবে বর্তমানে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষে পৌঁছেছে। ১৫০০টি সংস্থা ও ৯৫ লক্ষ কর্মী ৩-৪ বছরের মধ্যে ভারতে গড়ে উঠবে। বাজারের ব্যবসায়িক মূল্য ৩২ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ ২০১১ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে বছরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাহিনীর বাজার ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে। দেশে ২০২০ সালের মধ্যে এটা বৃহত্তম বাজার হয়ে উঠবে। এর মধ্যে আছে ট্রান্সপোর্ট, তদন্ত, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা, পাহারাদারির কাজ। কর্ণাটকের সরকার ২০১০-এ ৪০০ কর্মী ভাড়া করেছে প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি থেকে। বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেল সহ ১২টা জেলায় জেলের নিরাপত্তা রক্ষার কাজ আজ প্রাইভেট-বাহিনীর হাতে। বড় বড় জোত, চাষিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ‘সেজ’ এলাকার কীর্তিগুলিকে বিক্ষোভের হাত থেকে রক্ষা করতে এই সব বাহিনী নামানো হয়েছে। যেমন নামানো হয়েছে খনি এলাকাগুলোর দখল নিয়ে উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলোর বিক্ষোভ দমন করে বহুজাতিকদের স্বার্থ রক্ষা করার কাজে সালোয়া জুডুমের মতো ‘শান্তিরক্ষার’ বাহিনীগুলোকে।

ফিকি ও অ্যাসোচেম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে এই হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বিষয়টি ভাবতে বলছে। ভারতের বড় বড় শহরগুলির উন্নয়নের সংস্থা ডিএলএফ গ্রুপ নিজেই তার সিকিউরিটি সার্ভিস গড়ে তুলেছে। উদ্দেশ্য এই বাহিনী তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যা করার করবে। ফিকি ও অ্যাসোচেম-এর রিপোর্টের নির্যাস হল ক্রমবর্ধমান ধনী-গরিবের বৈষম্যের পরিবেশে একদিকে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, অন্যদিকে দারিদ্র পীড়িত জীবন— নাগরিক জীবনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে গণআন্দোলন বা গণ বিক্ষোভ হলে তা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য চাই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী, চাই গোয়েন্দা বাহিনী। এজন্য গড়ে উঠেছে ন্যাশন্যাল ইনটেলিজেন্স গ্রিড। দরকার প্রাইভেট সিকিউরিটি শিল্পের প্রয়োজনে সামরিক ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ। দরকার সমর শিল্প ও পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন। ‘নয়া অর্থনীতির উদারীকরণের পথে যেমন জিডিপি বাড়ছে, বাড়ছে ধন বৈষম্যও। এর সাথে খাপ খাইয়ে তাই প্রাইভেট সিকিউরিটি শিল্পকেও বিকশিত করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত অ্যাসোচেমের সম্মেলনে এই সতর্কবার্তা ধ্বনিত হয়েছে। নয়া আর্থিক নীতি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ফেলছে তাকে সুরক্ষার জন্যই এ সব দরকার। নয়া আর্থিক নীতির দ্বারা যে বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। বোঝা যায়, শিল্প সংস্থার হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতির প্রেক্ষাপটে শ্রমিক বিক্ষোভের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য বলা হয়েছে নিরাপত্তা কর্মীবাহিনী ও সংস্থাগুলি হবে ‘শিল্প বান্ধব’।

এদের বক্তব্য, মানবাধিকার সংগঠনগুলি, সংবাদমাধ্যম প্রভৃতি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রয়াসের সামনে যাতে বাধা না সৃষ্টি করে তা দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, কোনও সংগঠন ও মাধ্যম এ সব করলে নির্মমভাবে তাকে আঘাত করতে হবে। কোনও ভাবেই সেখানে মাথা নোয়ালে চলবে না। আইন, প্রশাসন, আদালত, রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় আসা যাওয়া করে, যারা দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক, রাজনৈতিক দলগুলির পোষা দাগী ক্রিমিন্যালরা,— সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়, জনজীবনে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নারীর ইজ্জত, লুঠেরারা যতই লুণ্ঠন করুক আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হোক, গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষ হোক, কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের জীবনে সাময়িক যতই আতঙ্ক ও বিষণ্ণতা সৃষ্টি করুক, সবই ব্যর্থ হবে জনশক্তি মাথা তুললে। জনশক্তি জনবিরোধী শক্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ফ্যাসিবাদী আক্রমণই শেষ কথা নয়। অবশ্য এ জন্য চাই সঠিক আদর্শ ও সঠিক রাস্তায় সংগ্রাম।

গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস ৫ আগস্ট উপলক্ষে ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হল।

... কতকগুলো ঘটনা আজ সর্ববাদীসম্মত, যেটা আপনারা সবাই মনে প্রাণে অনুভব করছেন, প্রতিদিন আলোচনা করছেন, বিচার করে দেখছেন, তা হচ্ছে এই, দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও ভারতীয় সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনও সমাধান হয়নি। হ্যাঁ, রাস্তাঘাট হয়েছে, কলকারখানা কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু একদিকে যেমন নতুন নতুন কলকারখানা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে বহু কলকারখানা লালবাতি জ্বালিয়েছে। বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। আমরা আগে জানতাম, কলকারখানা একটা দেশে হতে থাকলে বেকার সমস্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, শিল্পের প্রসার হতে থাকলে বেকারি হ্রাস পেতে থাকে। এই দেশে দেখছি উল্টো ব্যাপার। কিছু কিছু শিল্প-উদ্যোগ হচ্ছে। আমরা নাকি 'শিল্প বিপ্লবের' পথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। কিন্তু যত আমরা এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্য দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি, দেখছি বেকার সমস্যা তত বেশি দিনের পর দিন বাড়ছে, বেকারি বাড়ছে। এর কারণ কী? আমাদের জাতীয় জীবনে এটা একটা মূল প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত জাতির নৈতিক মান দিনের পর দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আজ এটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা আমাদের দেশ বলে আমরা এখানে গভীরভাবে ভাবছি, আমাদের ভাবতেই হবে। কিন্তু আজ যদি গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, এ বিষয়টা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপে, খোদ আমেরিকায় টিন-এজারদের (কিশোর-কিশোরীদের) নিয়ে একটা সমস্যা। সেখানে সমস্ত জাতির নৈতিক মান আজ দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কারণ কী? আমাদের দেশেও সবাই আমরা চিৎকার করছি যে, আমাদের সাংস্কৃতিক মান, জাতির নৈতিক মান নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কারণ কী? এ আর একটা মূল প্রশ্ন। প্রধানত এই দুটো প্রশ্নের উপর আমি আলোচনা করব। তারপরে এই প্রশ্ন দুটোর সমাধান কী, তার উপরে যদি সম্ভব হয় কিছু আমি আপনাদের সামনে বলব।

প্রথম কথা, এ দেশটা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'দেশ' কথাটা আমরা যখন শুধু বলি, 'দেশের স্বার্থ' কথাটা যখন আমরা বলি বা যাঁরা বলেন, তাঁরা একটা আসল ফাঁকি নিজেদের কাছেও চেপে যান, জনতার কাছেও চেপে যান, সেটা হচ্ছে, এই দেশটা আজ আর অবিভাজ্য বা অবিভক্ত একটা দেশ নয়। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভালো লাগুক না লাগুক, আমরা পছন্দ করি বা না করি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আমাদের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। তার একদিকে মালিকশ্রেণি, যারা দেশের ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত অধিকার করে রয়েছে। আর একদিকে যারা মালিক নয়, যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে কোনও রকমে দিন গুজরান করছে — হ্যাভ নট্স বা সর্বহারার দল। ভালো লাগুক বা না লাগুক, সমাজের এই চিত্রটিকে কেউ তার মনগড়া কোনও তত্ত্বের দ্বারা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না। দিতে গেলেই বিপত্তি। আর সেই বিপত্তিই এদেশে হয়েছে। এদেশে রাজনৈতিক নেতারা এই মূল সত্যটিকেই 'দেশের স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নতি' — এইসব কথা দিয়ে নিজেদের কাছেও চেপে রেখেছে, জনতার সামনেও চেপে রেখেছে, জনতাকে বুঝতে দেয়নি। এমনকী বামপন্থী নেতারাও যখন বক্তৃতা করেন, লেখেন, জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে পার্লামেন্টে বা অ্যাসেম্বলিতে বিতর্কে অংশ নেন, তাঁরা এই মূল সত্যটা সরাসরি তুলে ধরার চেষ্টা করেন না যে, একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনও পরিকল্পনা, 'জাতীয়' পরিকল্পনা, শ্রেণিস্বার্থ থেকে মুক্ত পরিকল্পনা হতে পারে না।

হয় তা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে 'জাতীয়' স্বার্থের লেবেল এঁটে চলবে, আর না হয় শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থে, যেটা সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থ, তার স্বার্থে চলবে। এই নিয়মকে গায়ের জোরে যারা অস্বীকার করতে চায় তারা আসলে নিজেদেরও ঠকায় যদি সৎলোক হয়, সৎ হলে তারা নিজেদেরও ঠকায়, জনতাকেও ঠকায় এবং এইভাবে দেশের মানুষ ঠকে আসছে। আর যদি অসৎ লোক হয় তবে তো কথাই নেই।

তাই আমি আপনাদের সামনে সোজাসুজি এই কথাটা বলতে চাইছি যে, আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু রয়েছে তা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। কোনও রূপ বাক্যজাল সৃষ্টি করার দ্বারাই এ সত্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদিও আমি জানি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এবং নিজেদের সবচেয়ে কট্টর বিপ্লবী বলে হামেশাই প্রচার করে থাকে এমন দু'একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা নানা বাক্যজাল বিস্তার করে, বিশ্লেষণের নাম করে যেকোনও উপায়েই হোক এই সত্যটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এদের এই কার্যকলাপ বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলোকে বিচার করে দেখা আজকের এই আলোচনায় সম্ভব নয়। তাই আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না। পূর্বে আমাদের নানা আলোচনায় এবং লেখায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমি বিশেষ করে আমাদের এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র কী, তা মোটামুটি আপনাদের সামনে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। আমাদের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, ঠিক ঠিক বুঝতে হলে, বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার চেহারা খানিকটা বোঝা একান্ত দরকার বলে মনে করি।

বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়া আজ এক ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট একটা গতানুগতিক সংকট নয়। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক ধরনের সংকট ছিল — সংকট ছিলই। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার পর থেকেই — পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পদার্পণ করার পর থেকেই — সংকটে জর্জরিত। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে সংকটের সামনে আজকে বিশ্বের পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ পড়েছে এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এর সঙ্গে পুরনো সংকটের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুরনো সংকটের মধ্যেও, হাজার সংকটের মধ্যেও, ১৯৩০-৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা ও 'মনিটারি ক্রাইসিস' (আর্থিক সংকট) সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বিশ্বপুঁজিবাদের বাজারে একটা রিলেটিভ স্টেবিলিটি ছিল, একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। এই কথাটি আমি কেন বলছি তা বুঝতে হলে এ কথা বোঝা দরকার যে, পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং তার সমাজ, তার উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে বাজারভিত্তিক। চাহিদা ও জোগানের উপর তার সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার বুনিয়াদ খাড়া হয়ে আছে। মানুষের প্রয়োজন, তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন এবং সেই অনুযায়ী বণ্টন— এ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরনই নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরন হচ্ছে— বাজারের চাহিদা, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, আমি বিক্রি করে কত লাভ করব, সোজা কথায় এই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুনিয়াদ। তাই বাজারের যদি স্থায়িত্ব না থাকে তাহলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি টলটলায়মান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, হাজার সংকট সত্ত্বেও, বহু মন্দা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী বাজার বরাবর একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু এবার বিশ্বযুদ্ধের পরে যে সংকট সে এবেলা ওবেলার সংকট। পূর্বেকার আপেক্ষিক স্থায়িত্বের নিয়ম পুঁজিবাদী বাজারে আজ আর নেই। সেটা শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সে অবস্থাটা আজ আর নেই। আর এটা না থাকার ফলে এ যুগের যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ একটা নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। তাই ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের যে বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, সে যুগে তাদের দেশের পুঁজিবাদের এবং পুঁজিবাদী শিল্পায়নের বিকাশ যে গতিতে, যে পদ্ধতিতে, যে আদর্শবাদের ভিত্তিতে হু হু করে ঘটেছিল, আমাদের দেশেও কেন আজ এই পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির, আমরা যদি একটু পরিকল্পনা করি, তাহলে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্য দিয়েই কেন সেইরকম হু হু করে অগ্রগতি হবে না, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন আমাদের দেশে একদিকে পরিকল্পনা আর একদিকে সংকট — একই সঙ্গে পাশাপাশি চলছে। আমরা পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে সবসময় একটা সংকটের ছায়া মিশে আছে। একদিকে আমরা লোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করছি, আরেকদিকে যে শিল্পগুলো চালু আছে সেগুলো ধসে পড়ছে। সেগুলোকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারছি না। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আমরা আমূল ভূমিসংস্কার করতে পারি না। কারণ যদি ব্লারিগরি বিজ্ঞানের সাহায্যে, উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা চাষবাস করতে যাই তাহলে এক ধাক্কায় গ্রামে যে মজুর উদ্বৃত্ত হবে, তারা শহরে আসবে। তাতে সমস্ত শহর ভেঙে পড়বে বিশাল বেকারবাহিনীর চাপে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসনকর্তারা এর ঝক্কি নিতে কোনও মতেই সাহস করতে পারে না। কারণ গ্রামীণ এই উদ্বৃত্ত মজুরদের কাজ দেওয়ার মতো শিল্প পরিকল্পনা করার ক্ষমতা শাসকদের নেই। তেমন দ্রুতগতিতে শিল্পবিকাশ ঘটানো বর্তমান পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে কোনও মতেই সম্ভব নয়।

কিছু কিছু পরিকল্পনা হচ্ছেই, তা করতেই হবে সরকারকে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো করতে গিয়ে তারা পদে পদে মার খাচ্ছে। দুটো কারণে মার খাচ্ছে। এক হচ্ছে, বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারে পূর্বেকার সেই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আর নেই। উপরন্তু সেখানে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। আগের পুঁজিবাদী দেশগুলো কী রকম পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে? সমস্ত বিশ্ব তাদের কার্যত উপনিবেশ ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার বাজারের ভাগ বাঁটোয়ারা করে তার ভিত্তিতে তাদের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর আজ আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোর সামনে পরিস্থিতি কী? একদিকে এই নতুন, অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটা দেশই নিজেদের গড়ে তুলতে চাইছে এবং প্রত্যেকটা দেশই পুঁজিবাদী ঢং-এ তাদের অর্থনীতিকে গড়বার চেষ্টা করছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তাদের বাজারে প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারের চেহারা কী? পুঁজিবাদী দুনিয়ার থেকে একটা বিরাট অংশ, সমাজবাদী দুনিয়া, আগেই বেরিয়ে গেছে। বাকি যে অংশটা পুঁজিবাদী বিশ্ব-বাজার হিসাবে রইল, সেখানে হাজার প্রতিযোগী। এই অবস্থায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে— যারা পিছিয়ে-পড়া দেশ তারা সব এক হয়ে একটা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। আবার এই তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেরাই পরস্পরের মধ্যে টক্কর লড়ছে। তাদের মধ্যেই ঝগড়া। এদের মধ্যে যে একটু মোড়ল, যে একটু অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত, সে অপরকে দাবাতে চাইছে। অপরের বাজারে নিজের পুঁজি লগ্নি করতে চাইছে, অপর দেশে নিজের রপ্তানি বাড়াতে চাইছে, তাকে মূলত আমদানিকারক দেশে পর্যবসিতকরার চেষ্টা করছে। ফলে এখানেই দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বাজারের এই যে তীব্র দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সংকট— এটা হচ্ছে একটা দিক। আরেকদিকে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী? বেশিরভাগ লোক বেকার হচ্ছে। মজুররা খুবই কম মজুরি পায়। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক চাষি, তাদের বছরে ৩ মাসের বেশি কাজ নেই। এই যে বিরাট জনসংখ্যা যেটা গ্রামে থাকে, তার ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন হয় না যদি সেই উৎপাদন লাভ রেখে বিক্রি করা না যায়। সেই উৎপাদন তারা করবে না। এ অবস্থায় মালিকরা কম উৎপাদন করবে এবং তা বেশি দামে বিক্রি করবে অল্পলোকের মধ্যে। এভাবে অল্পলোকের মধ্যে বেশি দামে বিক্রি করে তারা লাভটাকে তুলে নেবে। ফলে জনসাধারণের অভাব তো ঘটবেই এ দেশে। কারণ বুনিয়াদি নিয়মে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বরুণ বিশ্বাসের হত্যাকারী ও মদতদাতাদের শাস্তির দাবি রাজ্যের সর্বত্র

'সব মরণ নয় সমান' প্রখ্যাত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের কথাগুলি ছুঁয়ে যাচ্ছিল ৫ জুলাই কলকাতার ভারতসভা হলে বরুণ বিশ্বাস স্মরণে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে।

বরুণ বিশ্বাস — এই নামটি আজ প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়ায় তৎকালীন শাসক সিপিএম এবং এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতী ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানকারী মাফিয়া বাহিনী অবাধ নারী নির্যাতন, তোলাবাজি ও সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। এর বিরুদ্ধে যখন কেউ মাথা তুলতে সাহস পাচ্ছিল না, তখন আদর্শবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের অনন্য ভূমিকা মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। গড়ে উঠেছে প্রতিবাদী আন্দোলন। সুটিয়ায় বছর বছর বন্যা রুখতে ইছামতী নদী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ। এগিয়ে এসেছিলেন বরুণ। আঘাত পড়েছিল কায়েমী

মিত্র ইন্সটিটিউটের সামনে থেকে পদযাত্রা

স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের হাতে ২০১২ সালের ৫ জুলাই সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সম্পাদক বরুণ বিশ্বাস তাঁর কর্মক্ষেত্র শিয়ালদহের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোবরডাঙা স্টেশনে নিহত হন। এক বছর পেরিয়ে গেলেও এই হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রীরা আজও অধরা।

এ বছর ৫ জুলাই বরুণ বিশ্বাস হত্যার এক বছর পূর্তির দিনে সুটিয়ায় প্রতিবাদী মঞ্চ আয়োজিত সভায় অসংখ্য মানুষ তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। নির্যাতিতা মহিলারা চোখের জলে স্মরণ করেন তাঁদের একান্ত ভরসাস্থল অত্যন্ত প্রিয় মানুষ বরুণকে। সভায় এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ তরুণ মণ্ডল বলেন, ভুলে গেলে চলবে না, সিপিএমের শাসনে সুটিয়ায় গণধর্ষণ ঘটেছে, শয়ে শয়ে মহিলা দুষ্কৃতীদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন, এখন তৃণমূলের শাসনেও কামদুনি, গেদে, রানিতলায় মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধ ছাড়া এর মোকাবিলা করা যাবে না। বরুণের মা গীতাঞ্জলি বিশ্বাস বলেন 'বরুণ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কামদুনিতে ছুটে যেত।'

'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি'-র উদ্যোগে এই দিন সকালে

সুটিয়ায় বরুণ বিশ্বাসের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ তরুণ মণ্ডল

কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে শহিদবেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা এবং অগণিত পথচলতি মানুষ। এরপর বেলা ২-৩০টায় মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে থেকে এক পদযাত্রা ভারত সভা হলের উদ্দেশে রওনা হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন চিত্র

আসানসোলে বরুণ বিশ্বাস স্মরণ

পরিচালক শতরূপা সান্যাল।

ভারত সভা হলে সভানেত্রী শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহারের পক্ষে সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার রণেন ধাড়া। কমিটির

হাজরা মোড়ে নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ও আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত

সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র সভার উদ্দেশ্য ও কমিটির কর্মসূচির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, সমাজকর্মী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের পক্ষে ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক নেতা তপন কুমার সামন্ত ও অন্যান্য বক্তারা তাঁদের স্মৃতিচারণায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বরুণ বিশ্বাসের সাহসী ভূমিকা তুলে ধরে তাঁর হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

হুগলির বৈঁচিতে অঙ্গীকার গোষ্ঠী

এই দিনই হাজরা মোড়ে সকাল ১০টায় নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে বরুণ বিশ্বাসের স্মরণে নির্মিত শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। কমিটির সভাপতি পার্থসারথি সেনগুপ্ত ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ ছাড়া ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ির কদমতলা মোড়, শ্রীরামপুর, কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক, দমদম সহ রাজ্যের সর্বত্র পদযাত্রা, সভা, ছবিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আন্দোলনের শপথ নিয়ে দিনটি পালিত হয়।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

উচ্ছেদের প্রতিবাদে অফিস ও ব্যবসা ধর্মঘট

উচ্ছেদ ঠেকাতে একদিকে আইনি লড়াই অন্যদিকে পথে নেমে আন্দোলন, উভয় পথই

নিয়েছেন বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাসিন্দারা। ২ জুলাই কলকাতার বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড় সংলগ্ন অঞ্চলের কয়েকশত ঘর-বাড়ি, অফিস, দোকান স্থায়ী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ছাড়াই উচ্ছেদ করে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো স্টেশন বানানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে অফিস ও ব্যবসা ধর্মঘট পালিত হয়। শতাধিক মানুষের মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত বিকল্প রুটে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য, বিকল্প রুটে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর লাইন বসলে উচ্ছেদ ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়েই যে মেট্রোর কাজ সম্ভব তা রাজ্য সরকার নিজেই বেশ কয়েকবার বলেছে। কিন্তু টাকা খরচ বাড়ার অজুহাতে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্পোরেশন তাতে কর্ণপাত করেনি।

সিটিজেন্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, কলকাতার উন্নত পরিবহণের স্বার্থের কথা বলে যে সমস্ত মানুষকে বাসস্থান অথবা রুটি রুজির সংস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হবে তাদের উপযুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসনের রূপরেখা স্পষ্টভাবে আগাম জানাতে হবে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট এই জমি অধিগ্রহণ বৈধ বলে যে রায় দিয়েছে, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুলিশি হেনস্থা

একের পাতার পর

শাসনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। বিরোধী কণ্ঠকে তারা স্তব্ধ করে দিয়েছিল। জরিমানা, খুন, থানায় মিথ্যা অভিযোগ জানানো এ সব নিয়মিত ঘটনায় পরিণত করেছিল তারা। লালগড়ের অসংখ্য নিরীহ মানুষ সহ এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদেরও জামিন-অযোগ্য ইউএপিএ আইনে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠিয়েছিল। ফলে রাজ্য জুড়ে এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যখন গোটা রাজ্যের মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়াল, তখনই সিপিএম নেতাদের সমস্ত কারিকুরি, সমস্ত চোখরাঙানি বন্যার জলে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। সেই পরিবর্তনের পথেই ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তৃণমূল সরকার। মানুষ আশা করেছিল, সিপিএম শাসনের সেই দমবন্ধকর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। যে গণতন্ত্র সিপিএম নেতারা কেড়ে নিয়েছিল, সেই গণতন্ত্র মানুষ ফিরে পাবে, অবাধে মত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছে?

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এতদিন সিপিএম তার একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়ে এসেছে, বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতে না দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আজ ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখছে রাজ্যের মানুষ। রাজ্য জুড়ে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়া, জোর করে প্রত্যাহার করানো, প্রচার করতে না দেওয়ার রেকর্ড স্থাপন করে চলেছে তৃণমূল সরকার। তা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছে যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতা, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড নন্দ পাত্রকে নির্বাচনে প্রচার চালানোর সময় তৃণমূল দুষ্কৃতী বাহিনী নির্মমভাবে প্রহার করে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

তৃণমূল নেতারা ভুলে যাচ্ছেন, রাজ্যের মানুষ সিপিএমের স্বেচ্ছাচার, দম্ভ, দুর্ব্যবহার, জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিঃসংশয় রায় দিয়েছিল। সেই মানুষ আজও সমানভাবে জাগ্রত রয়েছেন। তৃণমূল নেতারা যদি সংযত না হন, তবে তাঁদের প্রতিও মানুষের আচরণে কোনও পার্থক্য ঘটবে না।

২৩ জুন কলকাতার চেতলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের এ আই ডি এস ও-র সংবর্ধনা

গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই

চারের পাতার পর

এখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন হচ্ছে। তাই একটা জিনিস লক্ষ করবেন যে, দিনের পর দিন এদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হচ্ছে। এদেশের গরিব মানুষদের, এদেশের চাষি-মজুর ঘরের মেয়েদের আমরা কাপড় পরাতে পারছি না। এদেশের প্রত্যেকটা লোকের গায়ে জামা আমরা তুলে দিতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দেশের টনটন কাপড়, আমাদের দেশের মজুররা যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করে, তা বিদেশের বাজারে চলে যায়। ধুয়া তোলে ওরা— আমাদের বিদেশি মুদ্রা চাই, তাই আমাদের রপ্তানি বাড়াতে হবে। কারণ শিল্পের বিকাশের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমাদের আমদানি করতে হবে। আসলে এটাও আরেকটা মস্ত বড় ফাঁকি। এর একটা প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু এর আরেকটা দিকও রয়েছে। সেটা হচ্ছে বিদেশের বাজার ছাড়া ঐ মাল এখানে গুদামজাত হয়ে যাবে। এখানে কেনবার লোক নেই। এখানে যে দামে বিক্রি হবে সে দামে কেনবার লোকের সংখ্যা কী? কেনবার মানুষ নেই তা নয়, কিন্তু ঐ দামে কেনবার মানুষ নেই। অর্থাৎ জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় আয় এত সামান্য যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। স্বল্প মজুরির শ্রমিক, বিরাট বেকারবাহিনী এবং ৭৫ শতাংশ চাষিরকার্যত কোনও কেনবার ক্ষমতা নেই। তাহলে দেশের এ অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে কীভাবে? 'পরিকল্পনা', 'পরিকল্পনা' বলে চিৎকার করলেই হবে? ফলে আমাদের দেশের গোটা অর্থনীতি আজ একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে।

এখানে আরেকটা কথা আপনাদের আমি বলতে চাই। একথাটা আমি আমাদের দেশের অনেক অর্থনীতিবিদকেও বলতে চাই। যে কারণেই হোক, অনেকেই এই কথাটা বুঝতে চান না বা মানতে চান না। কিন্তু আমি যেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেটা আমি আপনাদের সামনে রাখব, আপনারা ভেবে দেখবেন। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশ তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশ, তাই নাকি এদেশে ফ্যাসিবাদের ঝোঁক কোনওমতেই দেখা দিতে পারে না, এদেশে শিল্পে সামরিকীকরণের ঝোঁক দেখা দিতে পারে না। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশ হলেও, আমি মনে করি, আমাদের দেশে ঠিক এই ঘটনাই ঘটতে শুরু করেছে। এই যে 'সামরিক বাজেট বাড়াও' রব উঠেছে এবং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি (জাতীয় জরুরি অবস্থা) আজও টিকে রয়েছে, এর পিছনে একটা গুরুতর অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এর বুনিয়াদটা এইখানেই যে, যতটুকু শিল্প পরিকল্পনা এখানে হচ্ছে, যতটুকু ইস্পাত শিল্প এখানে গড়ে উঠছে তাতে সবরকম উন্নতমানের ইস্পাত এখনও পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে না পারার দরুণ নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেমন নানা ধরনের উন্নতমানের ইস্পাত একদিকে বাইরের থেকে আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে, অপরদিকে আবার এইসব স্টিল প্ল্যান্টগুলোতে যেসব ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে তার অনেকখানি আমাদের বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। কারণ নিজের দেশের বাজারে সেগুলো যে বিক্রি হবে তা কীসে লাগবে? শুধু 'ইস্পাত উৎপাদন বাড়াও বাড়াও' করলেই তো হবেনা, স্টিল তো আর আপনি খাবেন না! যদি নিজের দেশে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য শিল্প এবং নানা ধরনের হাল্কা শিল্প হুহু করে বাড়তে না থাকে, তাহলে এই ইস্পাত কীসে লাগবে? ফলে যে ইস্পাত আমরা ইতিমধ্যেই উৎপাদন করছি, বাইরের বাজার সংকটের দরুণ এই ইস্পাত বিক্রির জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে একটা কৃত্রিম তেজিভাব চাই। নাহলে এই ইস্পাত কোথায় বিক্রি হবে? কারণ অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হচ্ছে, বাইরের বাজার মন্দা। এই অবস্থায় একদিন তো লালবাতি জ্বলে যাবে, সমস্ত স্টিল প্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মাল জমে যাবে, মজুত হয়ে যাবে। তাই অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব তৈরির প্রয়োজনেই রাষ্ট্রকে ক্রমাগত নিজেই এই ধরনের উৎপাদনের ক্রেতা হতে হচ্ছে। তাই রব উঠছে 'প্রতিরক্ষা শিল্প বাড়াতে হবে' — দেশের মানুষ খেতে পাক আর নাই পাক। যেখানে বাইরের বাজারে সংকট, অভ্যন্তরীণ বাজারও সংকুচিত সেখানে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় শিল্পোদ্যোগের ধারাকে খানিকটা অব্যাহত রাখতে হলেও প্রতিরক্ষা শিল্প এবং সামরিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবেই। তাই ডেফিসিট ফিন্যান্সিং-এর (ঘাটতি বাজেটের) উপর ভিত্তি করে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র ক্রেতা হচ্ছে ইস্পাতের এবং ডিফেন্স-এর জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের জিনিসের। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাজারের সংকট থেকে দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মুক্ত করার এই যে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, এটাই 'আমাদের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে', এই মনোভাবের পেছনে অনেকটা কাজ করছে। কিন্তু একথাটা দেশের মানুষকে বলা যায় না। তাই দেশের মানুষের কাছে একটা 'রাজনীতি' চাই— সেটা হচ্ছে 'ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি', 'দেশ বিপন্ন চারিদিক থেকে', 'গোটা ভারতবর্ষকে খেয়ে ফেলবার জন্য চারিদিক থেকে লোক রয়েছে, গিলে খেল বলে আমাদের, তাই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে ডিফেন্স-এর জন্য'। কিন্তু এরও আসল আর একটা কারণ যে অর্থনীতিতেই নিহিত রয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে। তা হচ্ছে ভারতের অর্থনীতি সংকট জর্জরিত অর্থনীতি। সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে নিজেকে খানিকটা ভারমুক্ত করবার চেষ্টা করছে। আমার একথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ এইখানে যে, আজও আমাদের দেশে ইমার্জেন্সি ও ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলস (ডি আই আর) টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দেশের প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দল বারবার ইমার্জেন্সি তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন ইমার্জেন্সি আজও তুলে নেওয়া হচ্ছে না এবং ডি আই আর নাকচ করা হচ্ছে না? গত চার বছর যাবৎ আমাদের উত্তর সীমান্ত শান্ত অবস্থায় রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়েছে এবং তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও কেন আজও ইমার্জেন্সি এবং ডি আই আর তুলে নেওয়া হচ্ছে না— এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে হলে আমি একটু আগেই যে আলোচনা আপনাদের সামনে করেছি, যদিও তা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে, তার তাৎপর্য আপনাদের সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। তা এই হল আমাদের 'সমাজবাদী' সমাজের পরিকল্পনাগুলোর ভিতরকার সত্যিকারের চেহারাটা। এই হল আমাদের পরিকল্পনাগুলোর, 'জাতীয়' পরিকল্পনাগুলোর আসল তাৎপর্য এবং ভেতরকার চেহারা। কাজেই যখন খাদ্য পাই না, 'সিভিল লিবার্টি' (নাগরিক অধিকার) নেই, হেন নেই, তেন নেই বলে চিৎকার করি এবং আন্দোলন করি তখন ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনীতির এই চিত্রটি সম্পর্কে এবং শাসকশ্রেণির চরিত্র সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন।

এখানে আরেকটা কথাও আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই। আমাদের দেশে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের একটা প্রচন্ড ঢেউ চলছিল তখন অতবড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে এ দেশের টাটা-বিড়লাদের দলের রাজনৈতিক নেতারা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। একটা বিপ্লবাত্মক লড়াই যখন গড়ে উঠছিল, তেমন সময়ে অতি সুন্দর এবং সুকৌশলে আপস করে স্বাধীনতা নামক একটি মাদকদ্রব্য খাইয়ে আমাদের ঝিমিয়ে দিল। গোটা দেশের স্বাধীনতা চলে গেল বুর্জোয়াদের হাতে, পুঁজিপতিদের হাতে। আমরা নাচতে আরম্ভ করলাম— দেশ স্বাধীন হয়েছে। একথার অর্থ এ নয় যে, দেশ স্বাধীন হয়নি। আমি বলছি, হ্যাঁ দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বাবা, আমরা তো শুধু জাতীয় স্বাধীনতাই চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম মজুর-চাষির রাজত্ব, জনসাধারণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার, বাঁচবার অধিকার। কারণ একটা কথা আমরা সেদিনও বুঝেছিলাম যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সমগ্র জাতি একটি অবিভাজ্য জাতি নয়, তা আসলে পরস্পর বিরোধী দুইটি শ্রেণিতে তখনই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তার একদিকে মালিক শ্রেণি, আরেকদিকে মজুর, চাষি এবং খেটে খাওয়া মানুষ। স্বাধীনতা যদি আসে দু'শ্রেণির হাতেই আসবে আর দু'শ্রেণিই মিলে মিশে দেশকে গড়ে তুলবে— এ কথা একমাত্র ধাপ্পাবাজরা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। ফলে সত্যিকারের কথা হল এই যে, স্বাধীনতা যদি আসে এবং তা যদি মালিকদের হাতে আসে তাহলে মজুরদের মুক্তির লড়াই আরেকবার লড়তে হবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য মানুষকে লড়তে হয়েছে, কিন্তু ফল চলে গিয়েছে মালিকদের হাতে। ফলে মজুর শ্রেণিকে, খেটে-খাওয়া মানুষকে তার মুক্তি অর্জন করতে হবে আরেকবার। কিন্তু যদি মজুর শ্রেণির হাতে স্বাধীনতা আসত তাহলে একস্বাধীনতা লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই জনসাধারণেরও মুক্তি অর্জিত হত। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে দু'টি জিনিস ছিল— দেশের স্বাধীনতা এবং গণমুক্তি। স্বাধীনতা হয়েছে, গণমুক্তি হয়নি। জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। মালিক শ্রেণি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এই যে মালিকি ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা আজ স্বেচ্ছায় দেশকে দুটো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলি কী? এ বিষয়ে এখন আমি আপনাদের কিছু বলব।

এক হল এই— গোড়ায় সদ্য সদ্য স্বাধীনতা যখন আমরা সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে পেয়েছিলাম, তারপরে কিছুদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটা ভূমিকা ভারতের শাসকশ্রেণিকে রাখতে হয়েছে, জাতীয় বুর্জোয়াদের রাখতে হয়েছে। এদেশের যারা পুঁজিপতিশ্রেণির প্রতিভূ দল এবং রাজনৈতিক নেতা, তাদের রাখতে হয়েছে। নিজেদের স্বার্থেই রাখতে হয়েছে। তখন তারা ভেবেছে যে, এদেশের অর্থনীতির বিকাশ করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার একটা দর কষাকষি করতে হবে। আর এই দর কষাকষিতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজবাদী শিবির — এইদুই শিবির থেকে মওকা নিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, 'এ তো বরং বুদ্ধিমানের কথা, তা জওহরলাল তো মস্ত বুদ্ধিমান। এ রকম লোকই তো আমাদের দরকার!' আমি বলি, হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভালো। কিন্তু বুদ্ধিটা সাধারণ মানুষদের জন্য, নাকি টাটা-বিড়লাদের জন্য? প্রশ্নটা এইখানে। বুদ্ধিটা খুব ভালো। বুদ্ধি খেলানোর মধ্য দিয়ে লাভ হচ্ছে, সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কার হচ্ছে? দেশের মানুষের, না এ দেশের পুঁজিপতিদের? তাদের শাসন সুসংহত হচ্ছে, না জনসাধারণের মুক্তির প্রশ্নটা আরও দ্রুত এগোচ্ছে, না সেটা সুদূর পরাহত হয়ে উঠছে? যত এদেশের বুর্জোয়ারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করছে তত গণতান্ত্রিক অধিকার তারা জবরদস্তি কেড়ে নিচ্ছে। তারা তাদের খুশিমতো শাসন করছে। তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতাগুলো কেড়ে নিচ্ছে, রাখতে দিচ্ছে না। দেশের অভ্যন্তরে যথেচ্ছভাবে তারা ক্ষমতা ব্যবহার করছে। খাদ্য, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা এইসব ন্যূনতম সমস্যাগুলোর কোনও সমাধান করা যাচ্ছে না। আর মজুরদের মুক্তি পুঁজিবাদী শোষণ থেকে, সে তো দুঃস্বপ্ন!

আমি আগেই বলেছি, অনেক কথা এসে যায়, কিন্তু এসে গেলেও আমি যেতে পারব না। যেমন এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণ কথাটার মানে কী? তা কি সমাজতন্ত্র? এর দ্বারা মজুরের মুক্তি আসবে কি? এর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? সোজা কথায় আমি মনে করি— না। কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে— যা ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সুদৃঢ় ভিত্তি। শিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা এদেশে ফ্যাসিবাদের বুনিয়াদ তৈরি হচ্ছে, সমাজবাদ রচনা হচ্ছেনা। অথচ এটা সমাজবাদের লেবেল এঁটে করা হচ্ছে। সমাজবাদের মূল কথা অন্য জিনিস। সমাজবাদ হচ্ছে যার দ্বারা উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য পাল্টে যায়, উৎপাদন-সম্পর্ক পাল্টে যায়, রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র পাল্টে যায়। আইন-শৃঙ্খলার যে নীতি, তার যে নৈতিক ভিত্তি সেটাই পাল্টে যায়। আমাদের দেশে কি সেরকম হয়েছে?

এ দেশে আইন-শৃঙ্খলার যে কাঠামো সেইটা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য আজও বহন করে চলছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আইন-শৃঙ্খলার ধারণার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের শাসকদের মূলত কোনও বিরোধ নেই। আপনারা লক্ষকরলেই দেখতে পাবেন, ব্রিটিশ আমলে দমনমূলক আইন যা ছিল সেগুলো বাতিল করা তো দূরের কথা, সেগুলোর চেয়েও মারাত্মক আইন এরা প্রবর্তন করে চলেছে। কারণ আজ আর সেইগুলোতেও এদের কাজ হচ্ছে না। সেই একই লাইন ধরে এরা নিত্যনতুন উদ্ভাবন করছে নতুন নতুন আইনের, কী করে আরও কত দমনমূলক ও নিপীড়নমূলক আইন করা যায় এবং সব কিছুই হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার নামে। তাই আমি এই প্রশ্নটা গোড়াতেই করেছিলাম— দেশটা কার? টাটা-বিড়লার? নাকি, এদেশে যারা খেটে খায় সেই কোটি কোটি মানুষের? যদি দেশটা এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দেশ হয় তাহলে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার নামে দমনমূলক আইনগুলো তাদেরই উপর প্রয়োগ করার দরকার হত না। বরং এগুলো প্রয়োগ করতে হলে করা হত চোরাকারবারিদের উপর, সমাজবিরোধীদের উপর, সাম্রাজ্যবাদের দালালদের উপর— তাদের উপর এগুলো প্রয়োগ করা হত। কিন্তু উল্টো করা হচ্ছে। এখানে এগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে জনগণের ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে। আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন করছে এদেশে কে? জনগণ নাকি নিজেই! জনগণকে নিয়েই যদি দেশ হয়, তাহলে সেই দেশের জনগণই নাকি আইন-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করছে! তাহলে ওদের দেশটা জনগণের দেশ নয়, ওদের দেশটা টাটা-বিড়লার দেশ। তাদের স্বার্থে তৈরি যে আইন ও শৃঙ্খলা, তাদের যাঁতাকলে পিষ্ট সেই দেশের মানুষ সেই আইন-শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে পারে না জীবনভর; ভয়ে ধুঁকে অনিচ্ছায় কিছুদিন বয়ে চলে মাত্র। কিন্তু অসহ্য হলেই ফেটে পড়ে, অস্বীকার করতে চায়, ভেঙে ফেলতে চায়। এটাই তো স্বাভাবিক। এতো বারবার ঘটবে এবং ঘটছেও দেশের মধ্যে তাই।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আসামে বিক্ষোভ

গুজব রটেছিল নগ্ন মানুষগুলি আসলে ভূত। ভূতের ভয়ে মানুষ থরহরিকম্প। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাতে অনেকেরই আতঙ্কে রাতের ঘুম চলে গেছে। যাবে নাই বা কেন। কারণ এইসব মহাদানব নারীর ইজ্জতও লুটেছে। ঘটনাটা আসামের তেজপুর শহরের পার্শ্ববর্তী ঢেকিয়াজুলি, তেলামারা, বরবিল, বিহাগুড়ি প্রভৃতি এলাকায়। ঘটনার খবর স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বেরিয়ে এসেছে কিছু চাঞ্চ ল্যকর তথ্য। দেখা গেছে, এটা একদল সমাজবিরোধীর ছক, যার পেছনে রয়েছে পঞ্চ ায়েত নির্বাচনে পরাজিত কিছু কংগ্রেস প্রার্থীর উর্বর মস্তিষ্ক।

হঠাৎ কংগ্রেস প্রার্থীরা কেন ভূত সাজতে গেল? আসলে পঞ্চ ায়েত নির্বাচনে গ্রামবাসীরা কংগ্রেসকে ভোট দেয়নি বলে, এ ভাবেই তারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)-র মহিলা সংগঠন। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও এলাকায় পুলিশি টহলের দাবিতে ১ জুলাই তেজপুর শহরে বিক্ষোভ দেখায় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। হেম বড়ুয়া হল থেকে পাঁচ শতাধিক মহিলার দৃপ্ত মিছিল ডি সি অফিসে যায় এবং জেলা সমাহর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড স্বর্ণলতা চালিহা পরাজিত কংগ্রেসের এই কুকীর্তির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, গ্রামের পর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, অথচ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিল না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএমের নানাবিধ সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ভূতের ছদ্মবেশে এহেন সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে অভিনব।

মেদিনীপুরে বহু দাবি আদায় অ্যাবেকার

লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরে এক গুচ্ছ দাবি আদায় করল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগ্রামী সংগঠন অ্যাবেকা। ২৮ জুন দুই সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক মেদিনীপুর জোনাল ম্যানেজারের দপ্তর ঘেরাও করলে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। দাবিগুলি হল,

১। বিদ্যুৎ দপ্তরের যে কোনও অফিসে গ্রাহকদের যে কোনও আবেদন অথবা অভিযোগপত্র প্রতিদিন গ্রহণ করা হবে, ২। নতুন সংযোগের জন্য গ্রাহককে 'টার্ন কি' পদ্ধতিতে সংযোগ নিতে বা ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে সই করতে বাধ্য করা হবে না। সংযোগ দিতে না পারলে তার কারণ লিখিত ভাবে জানানো হবে, ৩। হলুদ কার্ডে রিডিং লিপিবদ্ধ করা ছাড়া মিটার রিডিং নেওয়া হবে না। গ্রাহকরা এস এম দপ্তরে চাইলেই হলুদ কার্ড পাবেন, ৪। ত্রুটিপূর্ণ বিল এস এম দপ্তরে সংশোধন না হলে গ্রাহক ডি এম-কে জানাবেন এবং ওখানেই সংশোধন হবে। বিল অনাদায়ে বিপিএল গ্রাহকদের লাইন কাটা হবে না, ৫। ডব্লিউবিএসইডিসিএল কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের থ্রি ফেজ সিঙ্গল মিটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। যাদের সিঙ্গল ফেজ ৩টি মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে, তাদের ক্রমান্বয়ে মিটার পরিবর্তন করা হবে, ৬। বন্ধ মিটারে বিল হবে না। আবেদনের একমাসের মধ্যে মিটার পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। ৭। বিদ্যুৎ সংযোগের পূর্বেই যে সকল গ্রাহক বিল পেয়েছেন তাদের বিল ডি এম সংশোধন করে দেবেন, ৮। বকেয়া বিল মেটানোর ক্ষেত্রে এলপিএসসি মকুব করা হবে এবং প্রয়োজনে ১২টি কিস্তিতে বকেয়া টাকা পরিশোধ করার সুযোগ গ্রাহকরা পাবেন, ৯। অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জমা দেওয়া সিকিউরিটির টাকা আগস্ট ২০১৩-র মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে, ১০। অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের হিসাব বহির্ভূত জমা দেওয়া বাড়তি টাকা ফেরতের জন্য যে সকল গ্রাহক আবেদন করেছেন তাদের টাকা চলতি বছরের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে, ১১। ওমবাডসম্যান-এর আদেশ তৎপরতার সাথে কার্যকর করা হবে। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে গ্রাহক জোনাল ম্যানেজারকে জানাবেন। ১২। নতুন কৃষি বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০০০ টাকা ভর্তুকি পাওয়ার জন্য যে সকল গ্রাহক নির্বাচিত হয়েছেন তাদের পুনরায় আবেদন করতে হবে। কোটেশনে তাদের ৮০০০ টাকা বাদ দিয়ে বাকি ৩৫০০০ টাকা গ্রাহককে দিতে হবে, ১৩। গত বোরো মরশুমে (২০১২-২০১৩) যে সকল অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক মিটার বিহীন বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছিলেন তাদের সার্ভিস কানেকশনের জন্য যে টাকা নেওয়া হয়েছে তার থেকে কানেকশন চার্জ ৪০০ টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এ জন্য একটি ছাপা আবেদনপত্র অ্যাবেকার নেতৃত্বের কাছে পাওয়া যাবে, ১৪। নতুন সাবস্টেশন তৈরির কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হবে। পুরনো এইচ টি এবং এল টি লাইন মেরামত করা হবে। যদি কোনও লাইনের আশু মেরামতের প্রয়োজন হয় গ্রাহকরা জানালে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা হবে, ১৫। যে দুটি দাবি মেটানোর জন্য জোনাল ম্যানেজারের অফিস ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চাইবে তা হল — ক) লো-ভোল্টেজ ও লোডশেডিং-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বিল মকুব ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া, খ) ৯০ শতাংশ মিটারবিহীন অস্থায়ী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের যে হারে মাশুল নির্ধারণ হয়েছে সেই হিসাবে ১০ শতাংশ সিঙ্গল ফেজ ৩ টি মিটারের অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিল মকুব করা।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে

একের পাতার পর

ভোটের বাজারে অনেক ভোট পেয়ে গেল। বাইরের প্রচারের সাথে গরিব বেকার যুবকদের নানারকম সুযোগ সুবিধা বা চাকরির লোভ দেখিয়ে, মদ-মাংস হুল্লোড় চালিয়ে, ভোট মেশিনারি শক্তিশালী করে এই দলগুলি। এর মধ্যে পড়ে জনসাধারণ যেন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে যায়, দিশা হারিয়ে ফেলে। এর মধ্যেই আমাদের মতো যথার্থ বিপ্লবী দলকে শুধুমাত্র সাংগঠনিক শক্তি ও গরিব সাধারণ মানুষের দেওয়া অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে লড়াই চালাতে হয়। ফলে আমাদের একটি ভোট রক্ষা করাটাও একটা কঠিন সংগ্রাম। এই প্রচারের জৌলুস, টাকার স্রোত, সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে যে মানুষগুলি আমাদের ভোট দেন তাঁদের এক-একটি ভোটের মূল্য অপরিসীম। এই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের শক্তিকে রক্ষা করে বহু জায়গায় আমরা নির্বাচনে জয়ী হই, এবারেও জিতব।

সিপিএমের ৩৪ বছরে আমাদের বহু কর্মী মার খেয়েছে, প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। তীব্র আক্রমণের মুখেও আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ বহু জেলাতে বেশ কিছু পঞ্চ ায়েত ধরে রাখতে পেরেছি। আমাদের বহু কর্মী জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে পঞ্চ ায়েত নির্বাচনে মার খেয়ে। এখন তৃণমূল শাসনে এই সন্ত্রাস অব্যাহত। আমাদের পার্টি খেজুরি এবং নন্দীগ্রামে আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে কাজ করেছে, সেই খেজুরি এলাকায় আমাদের পঞ্চ ায়েত সমিতির প্রার্থী কমরেড অনিমেষ দাসকে ৬ জুলাই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে খেজুরি-২ নং ব্লকের হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চ ায়েতের মুণ্ডমারি গ্রামে কর্মীরা পোস্টার মারছিল, প্রচার করছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চ ায়েত সমিতির প্রার্থী স্নেহাশিস দাস, তাপস প্রামাণিক সহ আরও ২০-২৫ জন আমাদের কর্মীদের উপর প্রচণ্ড হামলা করে, মারধর করে, মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এরপর গুরুতর আহত কমরেড তরুণ সামন্ত, সুবোধ দাস সহ অন্যদের ফেলে রেখে অনিমেষ দাসকে তুলে নিয়ে যায়। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কারিগর, যিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুরু হওয়ার এক বছর আগে থেকে, যখন এই প্রজেক্ট বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্মণ শেঠের নেতৃত্বে নিচ্ছিল তখন থেকেই নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে এই চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়ে তাদের সংগঠিত করতে থাকেন, পরবর্তীকালে নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক, আমাদের দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ পাত্রকে ২২ জুন প্রচার সভা থেকে ফেরার পথে ঘিরে ধরে প্রচণ্ড মারা হয়। ভোজালি, বন্দুক, রড দিয়ে মেরে খুনের চেষ্টা করা হয়। অন্য কর্মী ও গ্রামবাসীরা তাঁকে একটা ট্রাকে তুলে দিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচায়। তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আক্রমণকারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। কোচবিহারে আমাদের দলের ৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৮ জন এখনও চিকিৎসাধীন। কমরেড তরেন বরদারের গোটা মুখ থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে চারটি জায়গায় আক্রমণ হয়েছে, ৭ জন আহত। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি, নন্দীগ্রাম, পটাশপুর, মুগবেড়িয়া, ময়না এই পাঁচটি থানায় ৩৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন, ১৯ জন গুরুতর আহত। বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিজয় দলুই প্রচার করছিলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে হাত-পা দড়ি বেঁধে ট্রেন লাইনের উপর ফেলে দেওয়া হয়, যাতে সে ট্রেনে কাটা পড়ে। কোনওক্রমে সে রক্ষা পায়। এছাড়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাগাল মার্ডি ৮২ বছর বয়স, তাঁকে প্রচণ্ড মারা হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লালন দাস গুরুতর আহত হন, ওখানে ৭ জন আহত হয়েছেন। বর্ধমানের আউশগ্রামে কমরেড মনসা মেটেকে ১ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তিনি তা করেননি। সোনারপুরে ৭৬ নং জেলাপরিষদ আসনে আমাদের কর্মীরা প্রচার করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এসে শাসিয়েছে, মহিলা কর্মী শিপ্রা হালদারকে বলা হয়েছে, প্রচার বন্ধ না করলে সন্ধ্যার পর যা খুশি হয়ে যেতে পারে। আমরা নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে জানিয়েছি। কোনও পদক্ষেপ তাঁরা নেননি।

একদিকে আক্রমণ, অন্য দিকে বিপুল টাকার স্রোত, একে হাতিয়ার করে সিপিএম , কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সমস্ত দল দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যেখানে আমাদের শক্তি আছে সেখানেই একজোট হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। আমি জয়নগর, কুলতলির কথা বলছি। সিপিএম তৃণমূল এমনকী কোথাও ৫০ হাজার কোথাও ১লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভোট কেনাবেচা করছে। কোথায় কাকে বেশি ভোট পাইয়ে দিলে এস ইউ সি আই (সি)-কে হারানো যাবে সেই অনুসারে ভোটের দরাদরি হচ্ছে। মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, ক্যানিং, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার এ সব জায়গায় এভাবেই ব্যাপকভাবে টাকা ছড়িয়ে অথবা হুমকি দিয়ে, মারধর করে, সাধারণ মানুষ শাসকদলের বিরুদ্ধে যাতে ভোট দিতে যেতেই না পারে সেই পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ঠিক একই প্রক্রিয়াতে সিপিএম এই কাজই করত, আজ এইরকম 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচনই চলছে।

তারিখ নিয়ে একটা ছেলেখেলা হল। একদিকে কংগ্রেস-সিপিএম, আর একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস, দুই পক্ষেরই দুটো হীন উদ্দেশ্য ছিল। এখানে জনগণের কোনও স্বার্থ ছিল না। এই দলগুলির স্বার্থেই এই কান্দল এতদূর গড়াল। এদের জন্যই প্রবল বর্ষায় চাষিদের অসুবিধার মধ্যে ভোট হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষরা রমজান মাসে সারাদিন উপবাস করেন। তাঁদেরও অসুবিধা হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনারের কাছে কয়েকটি দাবি করেছি। এক, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ভোট শুরু করতে হবে। দুই, যেখানে সংখ্যালঘু ভোটারের আধিক্য আছে, সেখানে অক্সিলিয়ারি কাউন্টার করতে হবে। পোলিং পার্সোনেল সহ ভোটাররা যাতে সন্ধ্যেবেলা ইফতার করার সুযোগ পান তার জন্য ভোটটা উপবাস ভাঙার মধ্যে শেষ করতে হবে। তিন, প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশনে ছাউনি করতে হবে, যাতে বৃষ্টিতে ভোটারদের অসুবিধা না হয়। আমরা সরকারের কাছেও এ কথা বলব। আমরা মনে করি, প্রথম সুনিশ্চিত করা দরকার, মানুষ যেন অবাধে ভোট দিতে পারে। শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী আনলে আর বুথের গোড়াতে দুজন পুলিশ বসিয়ে দিলেই মানুষ ভোট দিতে পারবে, তা হয় না। যে সন্ত্রাস আগে সিপিএম চালাত, বিরুদ্ধ মতের ভোটারদের আসতেই দিত না, আজকে সেই কাজটা তৃণমূল কংগ্রেস করছে। এই জিনিস বন্ধ হোক। কোনও দল যাতে মানুষদের ভোট দিতে যেতে বাধা দিতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

উত্তরাখণ্ডের দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরার হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ ও কমরেড মানব বেরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাতজেলিয়ায় ছাত্রী খুন
সাংসদের কাছে গ্রামবাসীরা

৬ জুলাই। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাতজেলিয়া বাজারে উপস্থিত জয়নগরের এসইউসিআই(সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের কাছে এলাকার মহিলা পুরুষ আর্জি জানালেন, এলাকায় ক্রমাগত বাড়তে থাকা নারী পাচার ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে সাংসদ যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। সম্প্রতি সাতজেলিয়ায় এক কিশোরী খুনের ঘটনায় তাঁদের ক্ষোভ সীমা ছাড়িয়েছে।

ছোটবেলায় মাতৃহীন ১৩ বছরের মিনতি মিস্ত্রি সাতজেলিয়া নটবর স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ক্লাসে প্রথম হত সে। গত জুন মাসে মেয়েটির বাবা অসুস্থ হয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি হন। দাদা চেন্নাইতে কাজ করতে চলে যায়। বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে কাকা-কাকিমা ২৪ জুন বিয়ে দেওয়ার নাম করে মিনতিকে বাইরে পাচার করার চেষ্টা করে। কিন্তু পড়ার প্রবল আগ্রহ থাকায় সে বিয়েতে রাজি হয়নি। দালালদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেয়েটিকে জোর করে পাচারের চেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা ওকে খুন করে বলে অভিযোগ। ২৫ জুন মিনতির মৃতদেহ পাওয়া গেলে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ তার কাকা, কাকিমা ও কাকার ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার পর থেকে যারা দোষীদের শাস্তির দাবি তুলছে, সমাজবিরোধীরা তাদেরই হুমকি দিয়ে চলেছে এবং মেয়েটির দাদা ও বাবাকেও ভয় দেখাচ্ছে।

৬ জুলাই সাংসদ সাতজেলিয়া বাজারে যাবেন শুনে এলাকার বিপুল সংখ্যক মহিলা সহ সাধারণ মানুষ এসে মিনতি মিস্ত্রির হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি এবং যারা হুমকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার লিখিত আবেদন সাংসদের হাতে তুলে দেন। ডাঃ মণ্ডল বলেন এই দাবিগুলির সাথে তিনি একমত। হুমকি উপেক্ষা করে জোটবদ্ধ হয়ে যেভাবে এলাকার মানুষ নারীপাচার, নারী নির্যাতন, মাদকপাচার ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাকে তিনি অভিনন্দন জানান। প্রশাসনের উচ্চ মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলেও এলাকাবাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাঁচিতে কনভেনশন

রাঁচি সহ সমগ্র ঝাড়খণ্ডে মহিলাদের উপর অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এরই প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, প্রাক্তন বিচারপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং বহু ছাত্র-যুবক-মহিলা এক কনভেনশনে মিলিত হন। ৩০ জুন রাঁচির বিধানসভা আবাসিক হলে ঐ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ করুণা ঝা, সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এ আই এম এস এস-রাজ্য সম্পাদক কমরেড কেয়া দে। প্রধান অতিথি ছিলেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অশোক প্রিয়দর্শী।

প্রধান বক্তা, এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, টিভি-বিজ্ঞাপন-সিনেমায় অশ্লীলতার প্রচার চলছে। ভিডিও গেমের মধ্য দিয়ে ছোটদের বিকৃতমনা করে দেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাটে খোলাখুলি মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। এগুলি আকস্মিক ব্যাপার নয়। জেনেবুঝে ষড়যন্ত্র করে এ জিনিস করা হচ্ছে, যাতে ছাত্র-যুবরা সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে বরং খাওদাও ফূর্তি কর — এই মানসিকতায় ডুবে থাকে। এই সমস্যার বিরুদ্ধে আমাদের শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই একমাত্র মহিলাদের উপর ঘটে চলা নির্যাতনকে আমরা রুখতে পারব।

কনভেনশন থেকে ২৭ সদস্যের নারী সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কেয়া দে।

ত্রিপুরাতে নারী নির্যাতন বাড়ছে,
বললেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

সিপিএম শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যেও নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ দিনদিন বাড়ছে। ৩০ জুন আগরতলা প্রেস ক্লাবে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত কনভেনশনে এ কথা বলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন পুর্ণিমা রায়। নারী নির্যাতন, হত্যা, পাচার বন্ধ করা ও মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এ দিন এই কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। তিনি বলেন, এ সব অপরাধ রুখতে সামাজিক সচেতনতা, প্রশাসনিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি ও অপরাধীর দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করা দরকার।

অধ্যাপিকা আল্পনা সিনহা বলেন, মহিলাদের নিরাপত্তা নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের পথেই সুনিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক সংস্থা মানবী-র সভানেত্রী কল্যাণী ভট্টাচার্য বলেন, মহিলাদের সংগঠিত করে সচেতনতা বৃদ্ধির পথেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলে নারীদের উপর অত্যাচার রুখতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন, এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা পুরুষশাসিত সমাজ এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উভয়ের দ্বারা নির্যাতিত, শোষিত হচ্ছে। তাই এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া নারী মুক্তি সম্ভব নয়।

কনভেনশনের শুরুতে সংগঠনের পূর্বতন সর্বভারতীয় সভানেত্রী প্রয়াত কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড শুক্লা চক্রবর্তী। পরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বসিরহাট কলেজে ডিএসও কর্মীদের উপর টিএমসিপি-র হামলা

সম্প্রতি বসিরহাট কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০ শতাংশ ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ছাত্র সংগঠন ডিএসও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা জানিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে টিএমসিপি তাদের উপর চড়াও হয়। ৫ জুলাই ফি-বৃদ্ধি বিরোধী ও প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস স্মরণে এবং পরের দিন নারী নির্যাতন বিরোধী পোস্টার মারতে গেলে টিএমসিপি ডি এস ও-র কলেজ কমিটির সভাপতি শুভাশিস দাস, লোকাল কমিটির সম্পাদক চঞ্চল পালিত সহ অন্যান্যদের মারধর করে। থানা প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলেও পরে অভিযোগ নিতে বাধ্য হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষও এই আক্রমণে নিশ্চুপ। ছাত্ররা টিএমসিপি-র এই ছাত্রস্বার্থবিরোধী ভূমিকা ও আক্রমণের প্রতিবাদে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে।

গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের

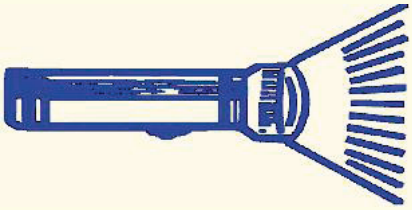

ব্যাটারি টর্চ চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in